ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 592-600
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.047

যে স্মৃতি নহে হারাবার : বিভূতিভূষণের ‘স্মৃতির রেখা’

ড. অনুপম নস্কর, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সাঁইথিয়া, বীরভূম*

Received: 12.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Curiosity, mysticism, questioning all these make the great thing called life the subject of the artist. Therefore, when the level of ordinary thought runs out everyday for the artist, it becomes a leisure for new construction. Although diary is initially meant as a daily routine, in many cases, it becomes a wonderful world of selfconsciousness in the creation of the writer. Bibhutibhusan Bandopadhyay's 'Smriti Rekha' is one search memory. What is private, what is unauthorised access to the artist, gives rise to the inquiry of the literary reader. Abandoning hope, memory, nature excitement of joy, understanding of eternity, these things have come up under the shelter of the diary. This work, which was often written while staying in areas like Bhagalpur, far away from the heart of Bengal, cannot therefore be called a mere diary. Apart from that, when the author did not sit in the court of character creation in his imagination, when no literary style is his goal, he said where he is in private. This is his self - reflection.

Keywords: Memories, Sense of Joy, Infinity, Interospection.

নাম-পরিচয়ে ডাক দেবার রীতি অনেকটাই সুবিধাজনক। ইনি ঔপ্যনাসিক, উনি গল্পকার, আবার কেউ সর্বগ্রাসী প্রতিভাগুনে সমস্ত কিছু। কিন্তু লেখন-বিশ্বে এমন কিছু নির্মিতি সম্ভবপর হয়ে ওঠে যাকে কোনভাবেই দেগে দেওয়া যায় না। তখনই প্রশ্ন ওঠে, এটা কি নিছকই গল্প, এটি কি কেবলই গান! শিল্পের পাশাপাশি শিল্পীর ক্ষেত্রেও এ কথা চলবে বৈকি। আমরা বলছি আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪ - ১৯৫০ খ্রীঃ) কথা। তাকে আমরা ঔপ্যনাসিক হিসাবেই দেখেছি, জেনেছি গল্পকার হিসাবেও। কিন্তু এমন কিছু নির্মাণ তিনি করেছেন যা তার ওই পরিচিতির পরিধিকে আরও একটু বাড়িয়ে দেবে। তখনই মনে হবে তাকে হয়তো সম্পূর্ণত জানা হয়নি সেভাবে ও।

দিনগত পাপক্ষয়ের মত সাধারণের অভিজ্ঞতায় প্রত্যেকটি দিন যখন বিনষ্টির বার্তা নিয়ে আসে, তখন কেউ আড়ালে আবডালে বসে দিনলিপি লিখে চলেন। তাঁর কাছে প্রতিটি মুহূর্তক্ষণ উপভোগ্য, ধীর সংবেদনে মধুর, স্মৃতি রোমন্থনে কখনো তা ‘স্মৃতির রেখা’। এতক্ষণে স্পষ্ট যে আমরা বিভূতিভূষণের

ডায়েরি বা দিনলিপির আলোচনায় ব্রতী হয়েছি। যা ছড়িয়ে রয়েছে 'তৃনাঙ্কুর', 'ঊর্মি মুখর', 'উৎকর্ণ', 'হে অরণ্য কথা কও' এর মত নানা নির্মাণের মধ্যে। এ অবসরে অবশ্য আমাদের আলোচ্য কেবলমাত্র 'স্মৃতির রেখা'। সন - তারিখ চিহ্নিত এই দিনলিপিটি প্রকাশের সম্ভাব্য কালসীমা - ২৭শে অক্টোবর ১৯২৭ থেকে ২৬শে এপ্রিল ১৯২৮।

কি আছে 'স্মৃতির রেখা'য়? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই মনে আসে প্রথিতযশা প্রাবন্ধিক প্রমথনাথ বিশীর সেই প্রাসঙ্গিক উক্তি - 'বিভূতিভূষণ আর একশ্রেণীর গ্রন্থ লিখেছেন সে সব মিশ্র উপাদানে গঠিত বলে তাদের কি নামকরণ হয় ভেবে পাইনি। 'স্মৃতির রেখা, তৃণাঙ্কুর, ঊর্মিমুখর, উৎকর্ণ, হে অরণ্য কথা কও' প্রভৃতি এক দেহে রোজনামচা, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, আত্মচিন্তা। [১]

নিছক কাকতালীয় হলেও এখানে একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে পারা যায় না। আর সেটি হলো রবীন্দ্র অনুষঙ্গ। আমরা জানি 'স্মৃতির রেখা' বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। আবার এটি যখন তিনি লিখেছেন (১৯২৪ থেকে ১৯২৮) তখন তিনি ত্রিশ - ঊর্ধ্ব যুবক, এইরকমই ত্রিশ - ঊর্ধ্ব বয়সের সীমানায় জমিদারি পরিদর্শনের দায়ভার নিয়ে শিলাইদহ, সাজাদপুর পতিসরে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ছিন্নপত্রাবলী' এই সময়কালের ফসল। এ পর্বে সমগ্র রবীন্দ্র চেতনায় একটি গতিময় সচল রূপছবি ধরা পড়েছে, বিভূতিভূষণও কিন্তু এ বয়সপর্বে ভ্রাম্যমাণ জীবন-পথিক। 'স্মৃতির রেখা' তারই রূপছবি। ছিন্নপত্রাবলী যেমন নিছক পত্র নয় 'স্মৃতির রেখা' তেমনি নিছক রোজনামচা নয়। তাতে আছে শিল্পীর নানা mood এর ভাষ্যরচনা।

স্মৃতির রেখার মতো দিনলিপিগুলির রচনাকালে লেখক যতই তার ব্যক্তি চিন্তায় মগ্ন থাকুন না কেন অনাগত কালের পাঠকবর্গ তাতে আড়ি পাতবে এটা খুব স্বাভাবিক। কেননা বিভূতিভূষণ নিজেই বলেছেন তিনি আজন্ম - পথিক; কাজেই তার শরিক হতে পাওয়া হয়তো বা দোষের নয়। বেশ কয়েকটি পর্যায়ে 'স্মৃতির রেখা' -র সারসত্যকে বিশ্লেষণে ব্রতী হব আমরা। যার ধাঁচা কতকটা এরকম -

ক. প্রকৃতির নিভৃত ভুবনে
খ. স্মৃতিমেদুরতা -য়
গ. আনন্দের বার্তায়
ঘ. সাহিত্যের কথায়
ঙ. প্রযত্নে ও প্রজন্মে

বলাবাহুল্য নিজের সময় নিজের মতো করে যখন ব্যয় করেছেন বিভূতিভূষণ তখনও তার আত্ম-অন্বেষণ চলেছে। এই প্রত্যেকটি পর্যায়ে আমরা তার আশ্চর্য হদিশ খুঁজে পাব। যা আমাদের চমকিত করবে ভাবিয়ে তুলবে।

ক. প্রকৃতির নিভৃত ভুবনে: কোন কোন সমালোচক বিশ্ব - প্রকৃতিকে বিভূতিভূষণের শিল্পী সত্তার মূল চালিকাশক্তি বলেন আবার কেউ বা বিশ্ব - মানুষকে প্রাধান্য দিতে চান। আসলে কে বড় কে ছোট কিংবা কার সঙ্গ দিতে কে এসেছে এসব প্রশ্নের সরল সমাধান তখনই উঠে আসবে যখন আমরা বিভূতিভূষণের একান্ত নিজস্ব দিনলিপিগুলি পাঠ করবো। তিনি নিজেই বলেছেন আমি 'আজন্ম পথিক'। এ পথ জীবনেরই পথ। আর বিশ্ব - প্রকৃতি এই জীবনের আধার স্বরূপ। সৃষ্টির প্রারম্ভ - লগ্ন থেকে এই বিশ্ব - প্রকৃতির অনুধ্যান

চলেছে। 'স্মৃতির রেখায়' প্রকৃতির নিভৃত ভুবন দ্বিবিধভাবে প্রতীয়মান অ. প্রকৃতির বিশুদ্ধ রূপবিভঙ্গ বর্ণনায় আ. স্মৃতির পটে প্রকৃতির রূপ চিত্রণে। ২১শে আগস্ট, ১৯২৫, ভাগলপুরে বসে লেখা দিনলিপিতে বর্ষাসন্ধ্যার স্পষ্ট ছবি -

> 'অন্ধকার সন্ধ্যা। বর্ষার মেঘে আকাশ ছাওয়া। জলারধারে বনে বড় বড় তাল গাছগুলো অল্প অল্প বার হওয়া তুঁতে রঙের আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার জলে সতেজ ঘন সবুজ ঝোপঝাড়, গাছপালায় বর্ষণক্ষান্ত ভাদ্র - সন্ধ্যায় মেঘান্ধকার ঘনিয়ে আসছে। এখানে ওখানে জোনাকির দল জ্বলছে, জলের ধারে কচুবনে ব্যাঙ ডাকছে, আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেছে, চারদিক নীরব, কোনদিকে কোন শব্দ নেই।'[২]

শব্দ, গন্ধ, বর্ণ নিয়ে এক সংবেদনশীল শিল্পীর চোখে প্রকৃতির এমন বর্ণনা কোন প্রথাগত শিল্পাঙ্গিকে নয়, তা দিনলিপিতে পাওয়া যাবে। এরকম উদাহরণ অনেক রয়েছে 'স্মৃতির রেখা'-য়।

কখনো বিহার কখনো ভাগলপুরের নির্জন প্রকৃতির ভুবনে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিভূতিভূষণ। মুখোমুখি হয়েছেন নিজের সঙ্গে মাঝে ছিল একমাত্র প্রকৃতি, সেই যেন সাক্ষী, সেই যেন দোসর। আর এই প্রকৃতি কেবলমাত্র যে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে এসেছে তাও নয়। কখনো তা স্মৃতি পথকে জাগিয়ে তুলেছে। ভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করে শিল্পীর তুলিতে বাংলার প্রকৃতি ফুটে উঠেছে। যেমন ২২শে মার্চ ১৯২৮ চৌধুরীটোলার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন -

> 'তারপর চৌধুরীটোলা। সেইখানটা গিয়ে পথের ডানধারে একটা শুধু মাটির পথ - দুধারে ঘন শিশু গাছের শ্রেণী - ছায়াভরা মাটির গন্ধ। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সেই পথ ধরলাম। একটু দূরে গিয়ে একটা পোড়া ভিটা মত - ঘেঁটু ফুলের একেবারে জঙ্গল। ঘেঁটু ফুলের গন্ধে একেবারে ভরপুর। ওদিকে আর একটা বাঁশঝাড়, একটা পাড়া। সেইখানটা গিয়ে মনে পড়ল অনেকদিন আগে সেই যে গিয়েছিলাম বাগান - গাঁয়ে রাখালী পিসিমার বাড়ি, ওদিকে কোদলার ধারে একটা পুরানো ভিটেতে - সেই কথা মনে পড়ল। - এই স্থানটা ঠিক যেন বাংলাদেশ'[৩]

বাংলা থেকে দূরে অবস্থান করলেও বাংলার নদী-মাঠ, বাংলার পথ-ঘাট, বাংলার আনাচ-কানাচ যে তার স্মৃতিতে কতটা সজাগ আছে তা এই দিনলিপি থেকে স্পষ্ট হবে।

খ. স্মৃতিমেদুরতা-য়: সমগ্র বিভূতি - সাহিত্য এবং সৃজনকর্মকে যদি দেখা যায় তবে স্মৃতিমেদুরতাকে একটি স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া যাবে। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন শিল্পীর কাছে এত যে মহনীয় হয়ে উঠেছে তা প্রায়শঃ ধরা দিয়েছে এক সুতীব্র nostalgia-য়। আশৈশব যে জীবন যাপন করেছেন তা যেন তার সমস্ত শব্দ-গন্ধ-বর্ণ নিয়ে স্ফুট - অস্ফুট আবেদন নিবেদন নিয়ে সংবেদনশীল শিল্পীমনে উপস্থিত থেকেছে। বিভূতিভূষণ তাকে এড়াতে পারেননি, হয়তো বা চাননি। তাকে তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করেছেন। তাইতো সচেতন শিল্প - প্রয়াসের বাইরে যখন তিনি একান্তে নির্জনে নিজের প্রত্যেকদিনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন সেই মৌতাতে - ও তার সঙ্গী হয়েছে স্মৃতি - রোমন্থন। যেমন, ২৯ এপ্রিল, ১৯২৫, ভাগলপুর থেকে -

> 'হঠাৎ পুরনো দিনগুলো মনে এলো। মনে এলো কতকগুলি ছায়াভরা বৈকাল, কতকগুলি সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির সন্ধ্যা সবগুলিই কেমন গভীর অনন্ত, রহস্যময়'[৪]

এখানে স্মৃতিমেদুর হওয়ার জন্যই কবির আয়োজন। কেবলমাত্র প্রকৃতি চিত্রনই মুখ্য নয়, কেননা ছায়াভরা বিকাল, সুন্দর জ্যোৎস্না, রাত্রির সন্ধ্যা এ সব বিষয় তো শাশ্বত। তা আগেও ছিল আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে কিন্তু যে সময়, যে বয়স তিনি যাপন করেছেন, সে সমস্ত অনুষঙ্গ কেবল স্মৃতিতেই ফিরে ফিরে আসে। এ প্রবণতা শিল্পীর মনে এমনই এক ভাব কল্পনার জন্ম নিয়েছে কোথাও কোথাও -

> 'হঠাৎ যেন মনে হল হাজার বছর আগে যেসব পাখি বনে বনে গান গেয়ে চলে গিয়েছে, আজ এই ছায়াভরা সন্ধ্যায় তারাই যেন আবার কোথা থেকে গেয়ে উঠলো। যেসব ছেলে মেয়েরা হাজার বছর আগে মা-বাবার কোলে মিষ্টি হাসি হেসে কতদিন হলো ছেলেবেলায় দেখা স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে আজ সন্ধ্যায় সেই সব অস্পষ্ট দূর অতীতের ছেলেপিলের মিলিয়ে যাওয়া হাসিরাশি - নদীর ধারে বনে বনে মাঠে মাঠে ঝোপে ঝোপে - ফুল হয়ে ফুটে গোধূলির আঁধার আলো করে আছে।'[৫]

প্রকৃতি এবং মানুষের এই আত্যন্তিক বিজড়ন আসলে বিভূতিভূষণকে সংবেদনশীল করে তুলেছে স্মৃতিসজ্জায়। যখন তিনি চেনা - পরিচিত স্থান অতিক্রম করে বিহার - ভাগলপুরে দিনাতিপাত করেছেন তখন দুরবিসর্পী রোমান্সের মতো স্মৃতির অতল থেকে যেন জেগে উঠেছে সেসব অনুষঙ্গ। সেখানে কত নূতনের সংযোজন হবে, কত তুচ্ছ প্রসঙ্গ মুখ্য হয়ে উঠবে তা কেবল শিল্পীই জানেন।

গ. আনন্দের বার্তায়: সমগ্র বিভূতি সাহিত্যপাঠক জানেন বিভূতিভূষণের সাহিত্য রচনায় প্রকৃতি যেমন তার স্ববৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত, তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর মানবজীবনও তেমনি মুখ্য। এই দ্বিবিধ বোধই তাকে জীবনের প্রতি সংবেদনশীল করেছে, কখনো করেছে প্রশ্নতাড়িত। তাইতো নির্জনে, একাকীত্বে যখন ভাগলপুরে দিনাতিপাত করছেন তখন তার মনে হয়েছে -

> 'সকলে আনন্দকেই খুঁজছে'[৬]

কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে আনন্দ? ৩০ এপ্রিল ১৯২৫, ভাগলপুর থেকে লিখছেন -

> 'জগতের অসংখ্য আনন্দের ভান্ডার উন্মুক্ত আছে গাছপালা, ফুল, পাখি, উদার মাঠঘাট, সময়, নক্ষত্র, সন্ধ্যা, জোৎস্নারাত্রি, অস্ত সূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূন্য ... এসব জিনিস থেকে এমন সব বিপুল অবক্তব্য আনন্দ অনন্তের উদার মহিমা প্রাণে আসতে পারে - সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট, অসীম, শান্ত-উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোন জ্ঞান পৌঁছায় না।'[৭]

এ সমস্ত কথা কোন আবেগের জিনিস নয়। বিভূতিভূষণ নামক শিল্পী মানুষটি স্থির সংবেদনে স্থির বিশ্বাসে তার জীবনে ও কর্মে এই সমস্ত কথার প্রতিষ্ঠা। তাই জাগতিক বস্তু বা material সংগ্রহে সেখানে কেবল প্রয়োজন মেটে, তা কোন আনন্দ দিতে পারে না। আনন্দের সামগ্রিক রূপঅনুধ্যান ছিল তার অন্বিষ্ট। তাই সে দুঃখের হা হুতাশে মানুষের জীবন নিরন্তর পাক খায় তাকে তিনি দেখেছেন এভাবে -

> 'Sadness জীবনের একটা অমূল্য উপকরণ - sadness ভিন্ন জীবনের profundity আসে না - যেমন গাছে অন্ধকার রাত্রে আকাশের তারা সংখ্যায় ও উজ্জ্বলতায় অনেক বেশি হয়, তেমনই বিষাদবিদ্ধ প্রাণের গহন গভীর গোপন আকাশে সত্যের নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ও জ্যোতির্মান হয়ে প্রকাশ পায়।'[৮]

দুঃখ আছে বলেই সুখের উপলব্ধি মধুর হয়ে ওঠে, না হলে তা হতো একঘেয়ে এবং বহু ব্যবহারে মলিন। এ কথা শিল্পী তার ভাব কল্পনায় জেনেছেন; তাইতো বারংবার তার হয়েই সওয়াল করেন-

> 'চোখের জল, কান্না অত্যাচার না থাকলে বিশ্বের সৌন্দর্য থাকত না। সব সুখ, সব পরিপূর্ণতা, সব ঐশ্বর্য, সব সন্তোষ শান্তি কেবল মরুভূমির মতো ভয়ানক খাঁ খাঁ করত। মাঝে মাঝে আর্তদের চোখের জলের শ্যামশান্তিভরা ওয়েসিস আছে বলেই তা করুন মধুর হয়েছে।'[৯]

এই যে উপলব্ধির জগৎ তা ফলপ্রসূ হয়ে উঠতো না যদি না দিনানুদিনের পাকে, তুচ্ছতায় মন আটকে যেত তা ওই সীমানাকে ছুঁয়েই সীমানা অতিক্রম। ভুয়োদর্শী এভাবে কখন যে সত্যের সন্ধানী হয়ে ওঠেন, তার অন্বিষ্ট, অভীপ্সিত জগত হয়ে যায় আরো গভীর, বিস্তৃত -

> 'এই নির্জন রাত্রিতে মনে হয় সুখ আছে এক জিনিসে। কি সে? মনকে প্রসারিত করে এই অনন্তের অসীমতার সঙ্গে এক করে দেবার চেষ্টা করবো। মনে ভাবো অনন্ত আকাশের এই ছোট্ট একরত্তি পৃথিবীটার মতো শত শত লক্ষ লক্ষ অজানা জগত - তার মধ্যে অজানা প্রাণীদের সেসব কত অজানা অদৃষ্ট ভয়ানক জীবনযাত্রা কত সুখ দুঃখ, কত আনন্দ। সেসব কি অজানা উচ্ছ্বাস - তোমার মন অসীমতার রহস্যে ভরে উঠবে। ক্ষুদ্রত্ব ভেসে যাবে অনন্তের অমৃত জোয়ারে।'[১০]

আনন্দের পরিপূর্ণ বোধই শিল্পীকে অনন্তের ইশারা দিয়েছে কিংবা অনন্তের উপলব্ধিতেই আনন্দ হয়েছে বাঙ্ময়। উভয়ই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। আত্যন্তিক জীবনপ্রীতিই এর মূল কথা -

> 'অনন্ত যে তোমার চারিধারে প্রসারিত, তোমার পায়ের তলার তৃণদলের শ্যামলতায়, তোমার কোলের শিশুর মুখের হাসিতে, তোমার আঙিনায় পাখির ডাকে, সন্ধ্যায় ঝিঁঝির সুরে, নৈশপাখির পাখার আওয়াজে। কিন্তু আমি শুনব না, আমি দেখব না, আমি চোখ বুজে আছি - কার এত স্পর্ধা আমার চোখ খোলে।'[১১]

দুঃখবোধ, sadnesS এর কথা দিনলিপিতে শিল্পীর আখরে যেমন ভাষাময় হয়েছে তেমনি মৃত্যুবোধও জেগেছে। ২৮শে নভেম্বর ১৯২৭ এর দিনলিপির পাতায় রয়েছে -

> 'এসব চলে যাবে জানি। আবার নূতন আসবে জীবনে আরও কত কত আসবে। এও ঠিক একদিন সব বন্ধ হয়ে যাবে। একদিন স্নিগ্ধ অপরাহ্নে, বাবলাবনের ছায়ায়, ইছামতির তীরে বনঝোপের বিহঙ্গ তানের মধ্যে নীরব শান্তির কোলে এই জীবনের দেওয়া নেওয়া সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে কি? মানুষ অনন্তের যাত্রী। তার পথ ঐ দূর ক্ষীণ নক্ষত্রের পাশ কাটিয়ে দূর কোন অনন্তলোক অনন্তকালের পথিক, যাত্রী সে ... আমি এই যাওয়া আসার স্বপ্নে ভোর হয়ে বড় আনন্দ পাই।'[১২]

কি অপূর্ব দার্শনিকতা, এ ভাষা কি কেবল গদ্যের ভাষা। প্রথিতযশা কোন কবির মতো ভাবকল্পনায় তন্ময়, লাবণ্যে উজ্জ্বল।

ঘ. সাহিত্যের কথায়: ডায়েরি বা দিনলিপি কোন প্রথাগত শিল্পাঙ্গিক নয় এখানে তাই সরাসরি শিল্পচর্চা চলবে সেই আশা না করাই শ্রেয়। তাছাড়া সে অবকাশও কোথায়! ভ্রাম্যমাণ শিল্পীর তুলিতে নিজের সময় নিজের মতো করে ব্যায়িত হচ্ছে সেখানে যতটুকু যা মিলবে তা উপরি পাওনা। নানা প্রসঙ্গে নানান কথার ভাঁজে ভাঁজে স্বগত ভাষণের মতো লেখক অনেক কথা বলে থাকেন যা কখনো কখনো হয়ে ওঠে মূল্যবান। যেমন -

> 'সাহিত্যে এই ভাবজীবন ফোটানোর প্রচেষ্টাই আসল। সাধারণ মানুষের ভাব জীবন খুব গভীর নয় - অনেকের মন এমন ভাবে তৈরি যা কিনা কোন বিষয়েই গভীরত্বের অভাবে জীবন বড় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মনের এই দৈন্য অর্থে পূর্ণ হয় না, ঐশ্বর্যে নয়, সাংসারিক বা বৈষয়িক সাফল্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এইসব অপূর্ব অনুভূতি আসে অনেক সময় বিচিত্র জীবন প্রবাহের ধারার সঙ্গে উপযুক্ত গড়ে ওঠা মনের সঙ্গ'।[১৩]

এই জীবনসম্ভূত ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভূতিভূষণের সাহিত্য মধ্যে। এছাড়া সাহিত্য কিভাবে জন্মায়, শিল্পীদের কাজ কি? এসব নিয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভূতিভূষণ তার দিনলিপিতে মন্তব্য করেছেন। যেমন ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ এ সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের মধ্যে সম্বন্ধের কথা বলতে গিয়ে জানালেন -

> 'সাহিত্য শিল্পীদের জীবনের প্রতিবিম্ব। যে যুগে তারা জন্মেছে তাদের চেষ্টা হয় সকল দিক থেকে সে যুগের একটা স্থায়ী ইতিহাস লিখে রেখে যাওয়া।[১৪]

রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই বোধহয় তার আত্মস্মৃতিমূলক রচনা 'ছেলেবেলা' - র শুরুতেই লিখেছেন 'আমার জন্ম হয়েছিল সেকেলে কলকাতায়।' স্থানিক ভূগোল, সময়, বৃহত্তর ভাবে সেই যুগের সাধনায় সাহিত্যিক শিল্পীর সাধনা হয়ে ওঠে। কিন্তু কেবল যুগের সাধনাকেই চরিতার্থ করবেন শিল্পী? বিভূতিভূষণ লিখলেন -

> 'প্রত্যেক মানুষই নতুন চোখে দেখে। প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন। তাই সকলেরই কথা কৌতুহল জাগায়। সাহিত্য শুধু জগৎ টাকে কে কি চোখে দেখছে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্ণিত নায়ক - নায়িকার পেছনে শিল্পী তার আবাল্য দীর্ঘ জীবনের সকল সুখ - দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। কল্পনাও কিছু না কিছু অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে তবে শূন্য ভর করে - সেসব সনেটের পিছনে হ্যামলেটের পিছনে শেক্সপিয়র গুপ্ত থেকে ধরা দিয়েছেন।'[১৫]

একই বিষয় নিয়ে লেখা সাহিত্য কিভাবে অভিনব হয়ে ওঠে তার উত্তর বোধহয় এখানে মিলবে।

'স্মৃতির রেখা' -য় স্বরচিত সাহিত্যের অনেক সংবাদ মিলবে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যই আমাদের অন্বিষ্ট, যেমন -

> ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ 'আরণ্যক' উপন্যাসের রচনার ইঙ্গিত
> ১ লা মার্চ ১৯২৮ 'ইছামতী' উপন্যাস রচনার প্রসঙ্গ

এভাবে মূলত আরণ্যক এবং ইছামতী উপন্যাস রচনার সংবাদ আমরা 'স্মৃতির রেখা' -তে পাব। একটি রচনা প্রকাশের বহুদিন পূর্বেই তার নির্মাণ যে লেখকের মধ্যে চলতে থাকে। সাধনার মতো একটু একটু করে সে বিশ্ব - সৃজন চলে নীরবে নিভৃতে; দিনলিপিতে 'আরণ্যক' কিংবা 'ইছামতী' র প্রসঙ্গ তা প্রমাণ করে।

দিনলিপির স্বল্প - আয়াসে বিভূতিভূষণকে আমরা কেবল রোজনামচা লিখিয়ে হিসাবে পাই না। সাহিত্যকে তিনি কোনভাবে এড়িয়ে যেতে পারেননি তার প্রমাণ অবশ্য পেয়েছি। সাহিত্যের বিশুদ্ধ আলোচনা তার অনেক টুকরো কথায় উঠে এসেছে, সেগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে বলে আমাদের মনে হয়। বিশেষত তত্ত্বের গাম্ভীর্য থেকে বের হয়ে নানা সরল অনাড়ম্বর উদাহরণ সহযোগে সাহিত্যিকের চোখে সাহিত্য যখন ধরা পড়ে তখন তা অন্য মাত্রা পায়। আবার নিজস্ব সৃজনকর্মের সম্পর্কেও বলেছেন। শেষাবধি এই প্রথিতযশা শিল্পী তার সাহিত্যের স্বীকৃতি বিষয়ে কি জানালেন -

'হয়তো একান্ন বছর পরে আমার কোন চিহ্ন পৃথিবীতে খুঁজে মিলবে না, কিন্তু আমার এই লেখা হয়তো থেকে যাবে। হয়তো কত লোকের মনে আশা সান্ত্বনা দেবে। হয়তো পাঁচশত বছর পরে যদি আমার লেখা বেঁচে থাকে তবে.... অনেক প্রাচীনকালের এক লেখক হয়ে যাব ... অনাগত ভবিষ্যতের সেসব বংশধরগণের মধ্যে আমি আলো জ্বেলে, তেল খরচ করে আমার যথাযোগ্য বুদ্ধির অর্ঘ্য, যতই সামান্য হোক যতই অকিঞ্চিৎকর হোক তবু ওদের দিতেই হবে। মনের মধ্যে সে প্রেরণা যেন অনুভব করছি, তারপরে তা বাঁচুক আর না বাঁচুক। আমি আর দেখতে আসবো না।' [১৬]
এই নিরাসক্তি একজন শিল্পীর মূল শক্তি। যা তাকে আবহমান কালে বাঁচিয়ে রাখবে।

ঙ. প্রযত্নে ও প্রজন্মে: বস্তু বিশ্বের মধ্যে উপস্থিত থেকে শিল্পী সাহিত্যিক তার 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষামপ্রজ্ঞায়' ভাববিশ্ব সৃজন করেন। দ্রষ্টা থেকে স্রষ্টা হয়ে ওঠেন। এ এক আশ্চর্য উপলব্ধির জগৎ। যা কোনোভাবেই সুলভ এবং সহজ নয়। প্রায় ক্ষেত্রেই আত্যন্তিক জীবনপ্রীতি থেকে এমনতর বোধের জগৎ সৃজিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই এক জগতের অধিপতি হতে পেরেছেন বলে আমরা মনে করি। কিন্তু শুধুই কি সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে তা ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে। একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে, ভাবপথিক হিসাবে তিনি অনাগত মানব - প্রজন্মের কথা ভেবেছেন, তাকে প্রযত্নে লালন করেছেন। যখন একা থেকেছেন, নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলেছেন, তখন কি কেবল নিজের কথা ভাবছেন।

২২ শে জুন ১৯২৫, ভাগলপুর থেকে লিখেছেন -

'আজ বসে বসে অনাগত দূর ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ছে। .... অনাগত শিশু ও প্রপৌত্র ও অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্রদের জন্য কি রেখে যাব তাহা ভাবছি।'[১৭]
আবার কখনো লিখছেন -

'জীবনটা ছেলে খেলার জিনিস নয় এটা একটা serious জিনিস। যারা হেসে খেলে তুচ্ছ আমোদে প্রমোদে ফুর্তি করে কাটালে তাদের কথা ধরি না, কিন্তু যারা জীবনটাকে serious ভাবে নিতে যায়, নিঃস্বার্থভাবে নিজের সুখ না দেখে, তাদের উচিত এই উত্তরকালের শিশু বৃদ্ধ পৌত্র, অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রগণের জন্যে কিছু সঞ্চয় করে যাওয়া।' ১৮

এই যে সঞ্চয়ের কথা বিভূতিভূষণ বলেছেন তাকে material জগতের ধন - সম্পদ সঞ্চয় নয় তা জীবনকে ফলপ্রসূ করে তোলার একটি সুউন্নত ধারণা। যাকে তিনি নাম দিয়েছেন 'জনসেবা'। ৬ই জানুয়ারি ১৯২৬ ভাগলপুর থেকে লিখেছেন -

'এই তাসের ঘরের মধ্যে, এই মেঘের প্রাসাদ দুর্গের মধ্যে আসল জিনিসটা কি? জনসেবা - এ জীবনর নয়। যুগযুগের জনসেবা। বিশ্বকে উপলব্ধি করে, সত্যকে উপলব্ধি করে, শাশ্বত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করে ধ্যানে কল্পনায় ছবিতে তাকে এঁকে যাওয়া শিক্ষকতা নয়, জনসেবা দীন নিরহঙ্কাকার অথচ দৃঢ় পবিত্র হয়ে অবহিত মনে এই অতি মহৎ সার্থক সেবা।' [১৯]

সমগ্র বিভূতিসাহিত্যে 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপি হিসাবে পরিচিত হলেও তা একইসঙ্গে স্রষ্টা এবং তার সৃষ্টির ন্যূনতম পরিচয়। কেবলমাত্র দিনলিপি হলেও রোজনামচায় ক্ষান্ত হতে পারতেন বিভূতিভূষণ; কিন্তু তিনি সেখানে কোথায় থেমেছেন। এমনকি তার সাহিত্য এবং সাহিত্য জীবনের কথাতেও 'স্মৃতির রেখা' ফুরায় কোথায়? তা যেন বিভূতিভূষণের নিভৃত ভাবজীবনের ধ্যানের সম্পদ। যা বারংবার জানান দেয় তিনি

শুধু কেবল ঔপন্যাসিক, কেবল গল্পকার নন, তিনি কবি এবং নির্জন জীবন - সেবক। তাইতো তার গদ্যের প্রকাশ হয় লাবণ্যময়, ভাবকল্পনায় দীপ্ত। অকিঞ্চিৎকর, সামান্য, তুচ্ছ বারংবার শব্দ গন্ধ বর্ণ নিয়ে ধরা দেয়। কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা যাবে এই অবসরে -

অ. 'ছোট্ট ছেলে তার কচি মুখ দিয়ে ভুরভুরে কচি গন্ধ' [২৯ এপ্রিল ১৯২৫, ভাগলপুর]

আ. 'জনহীন মাঠের ধারে গ্রাম্য ফুলের দল যখন ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে অকারণে হাসে।' [২৯ এপ্রিল ১৯২৫, ভাগলপুর]

ই. 'অজস্র খইয়ের মত ফোটা ঘেঁটুফুলের দলের মত' [২২ শে জুন ১৯২৫, ভাগলপুর]

ঈ. 'শান্ত, আঁধার অপরাহ্নে বাড়ির পিছনের বন যখন সন্ধ্যায় অন্ধকারে ঢেকে আসে' [৯ই অক্টোবর ১৯২৫]

উ. 'এই রহস্য ভরা বিশ্বের বুকে স্পন্দনটা কান পেতে শুনতে ইচ্ছা হয় - আরো কত নক্ষত্র, কত জগৎ, কত প্রেম, কত মহিমা, কত সৌন্দর্য, অব্যক্ত, বিশাল, বিপুল, অসীম চারধারে দাঁড়ানো' [৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯২৬]

ঊ. 'সব সুখ, সব পরিপূর্ণতা, সব ঐশ্বর্য, সব সন্তোষ, শান্তি কেমন মরুভূমির মতো ভয়ানক খাঁ খাঁ করত।' [৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯২৬]

ভাব - কল্পনায় এভাবে গদ্যস্রষ্টা বিভূতিভূষণের প্রকাশ হয়েছে কবিত্বময়। কখনো তুলনায়, কখনো অনুপ্রাসিক ছন্দময়তায় এই গদ্য তাই কাব্যসম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে।

বিভূতিভূষণ হয়ে ওঠেন তাই নিভৃত কবি - শিল্পী। তবে, মনে রাখতে হবে, এই জীবনের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি আত্যন্তিক বিজড়িত তার চেতনা। কোন পলায়নপর মনোবৃত্তির তার মধ্যে আমরা সে কারণে খুঁজে পাই না। যখন তিনি বলেন -

> 'ভগবান আমি তোমার অন্যস্বর্গ চাই না - তোমার দৈবলোক, পিতৃলোক, বিষ্ণুলোক তোমার বিশাল অনন্ত নক্ষত্র জগৎ তুমি পূন্যাত্মা মহাপুরুষের জন্য রেখে দিও। যুগে যুগে তুমি এই মাটির পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে এসো। এই ফুল ফল, এই শোক দুঃখের স্মৃতি, এই মুগ্ধ শৈশবের মায়াজগতের মধ্যে দিয়ে বারবার যেন আসা-যাওয়া পথ তোমার আশীর্বাদে অক্ষয় হয়'।[২০]

যুগপৎ 'স্মৃতির রেখা' কবি বিভূতিভূষণের আত্মদর্শনও বটে। জীবনকে তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন সত্যের অনুষঙ্গে। আনন্দের কথা বলেছেন, বলেছেন অনন্তের কথা। সন্ধান করেছেন জীবন রহস্যের। তার বাক্য তাই যেন হয়ে উঠেছে আপ্তবাক্য। তা যেন উপলব্ধিতে সিদ্ধ, সত্য বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরবো আমরা -

অ. 'তরল আনন্দ অধ্যাত্ম জীবনের পরিপন্থী' [২৮ এপ্রিল ১৯২৫]

আ. 'জীবনটা ছেলেখেলার জিনিস নয়। এটা একটা serious জিনিস।' [৯ই অক্টোবর ১৯২৫]

ই. 'লেখাপড়া একটা খুব বড় মানসিক দুঃসাহসিকতা' [১২ই ডিসেম্বর ১৯২৫]

ঈ. কুল আঁকাড়ে তো সকলেই পড়ে রইল। দিক্ দিশাহারা অকুল রহস্য মহাজলধিতে কে 'বাচ' খেলতে চলবে - কোথায় সে বীর ব্রাত্য মুক্ত আত্মা [১২ ডিসেম্বর ১৯২৫]

উ. 'অতিমানব সেই, যে চিন্তায় বড়, অনন্তের সঙ্গে যে নিজের আত্মাকে এক করতে পেরেছে' [২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৭]

এই অবসরে, আপাত পরিচিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্মৃতির রেখা' -কে যেভাবে জানা গেল তা আর যাই হোক কেবলমাত্র রোজনামচা নয়। ভ্রমণের স্বাদুতা মেশানো, স্মৃতিমেদুরতায় আচ্ছন্ন একইসঙ্গে অতীতে ও ভবিষ্যতে চলাচল করেছেন। তার লক্ষ্য কেবলমাত্র প্রতিদিনের হিসাব রাখছে কই, উপলক্ষ্যই সেখানে অনেক ক্ষেত্রে বড় হয়ে ধরা পড়েছে। নিভৃতচারী, নির্জনতা - পিয়াসী একজন কবির সঙ্গসুখ যেমন কোন কাব্য পাঠে উঠে আসে 'স্মৃতির রেখা' -র সঙ্গ করলে তেমনি উপভোগ সম্ভব হয়ে উঠবে। কি ভাব - সম্পদে, কি শব্দ - সম্ভাবনায়, কি আত্ম - দর্শনে এই নির্মিতি বাংলা সাহিত্যে অনন্য এবং স্বতন্ত্র।

তথ্যসূত্র:

১. বিশী প্রমথনাথ, বিভূতি - রচনাবলী (প্রথম খন্ড),
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৩৬১, পৃঃ ৫৭
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, স্মৃতির রেখা,
ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ ১৩৬২, পৃঃ ১৫
৩. তদেব, পৃঃ ৯৭
৪. তদেব, পৃঃ ১১
৫. তদেব, পৃঃ ১১
৬. তদেব, পৃঃ ২৩
৭. তদেব, পৃঃ ১১
৮. তদেব, পৃঃ ১৮
৯. তদেব, পৃঃ ২৬
১০. তদেব, পৃঃ ৩৬ - ৩৭
১১. তদেব, পৃঃ ৩৭
১২. তদেব, পৃঃ ৪৬
১৩. তদেব, পৃঃ ৪০
১৪. তদেব, পৃঃ ৪১
১৫. তদেব, পৃঃ ৪১
১৬. তদেব, পৃঃ ২১
১৭. তদেব, পৃঃ ১২
১৮. তদেব, পৃঃ ১৯
১৯. তদেব, পৃঃ ২৮
২০. তদেব, পৃঃ ৬৮